পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

(ক)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ——

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান ।
আমারে দিয়েছ সুর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান ।

(বলাকা, ২৮)

এই "বেশী" টুকু সুরকে সুরে রূপান্তরিত করা — করার শক্তি ও সাধনাই জীব জগতের মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও অবদান ।

এটা বুঝতে গেলে প্রথম মানুষকে মানুষের দেহ - প্রাণ - মন - বুদ্ধিযুক্ত সীমাবদ্ধতাকে এবং তা থেকে তার মুক্তির সংগ্রাম ও সাধনাকে বুঝতে হবে । বিশ্বের তথা জীব জগতের বিবর্তন ও বিকাশ ধারায় মানুষের আবির্ভাব একটি তুঙ্গ সীমা । মেরুদণ্ডী, জরায়ুজ, স্তন্যপায়ী এই মানুষ জীবটি দেহের দিক থেকে, সমকালের জৈবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য দন্ত - নৃশংস ও তীক্ষ্ণ নখরাদিসকল শারীরিক অস্ত্র সজ্জা না পেয়েও কেমন করে টিঁকে থাকল, জীবজগতের শীর্ষে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করল এবং কোন শক্তি বলে করল, করতে পারল সেটি ভেবে দেখা প্রয়োজন ।

জড় — তার পর জীবের অর্থাৎ স্থাবর উদ্ভিদ ও জঙ্গম প্রাণীর আবির্ভাব । নিজ নিজ সীমাবদ্ধ জীবনধারনের পরিমিত শক্তি, স্বভাব এবং নির্দিষ্ট কালে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য রক্ষণে এবং নব সৃষ্টির সমন্বিত উদ্যম সাধনে বিকাশের দিকে যে প্রেরণা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত — সেই সূত্রে প্রাণের ক্ষেত্র থেকে মনবুদ্ধির ক্ষেত্রে যে উত্তরণ হয়েছে জীবজগতে তার আশ্রয় ও ভাজন মানুষ — কেবল মানুষ, অন্য কোন প্রাণী নয় ।

অতিকায় জীবের মাংসপেশী ও দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য আর কীট - পতঙ্গের বংশবৃদ্ধির অজস্রতা — এই দুই প্রান্ত সীমান্তের উপরিস্থিত মানুষের মন-বুদ্ধি-ঐশ্বর্য। জীববিজ্ঞানে মানুষের দেহযন্ত্রটি মেরুদন্ডের নিম্নতম সীমান্ত থেকে একেবারে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যে সুশৃঙ্খল প্রকাশ, তা জীবজগতে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় এক অভিনব সম্পূর্ণতা। আর মানুষের প্রকৃতিগত উদ্ভাবনের আবেগ — তার জিজ্ঞাসা ও চলিষ্ণুতা, সর্বাতিশায়ী জীবন সাধনার বিরামবিহীন প্রয়াস মানুষের, মানবজাতির জন্মলব্ধ অপরিহার্য সংস্কার। মুখ্যতঃ মানুষের জীবন বিকাশ ধারা দ্বিমুখী। বহির্জগৎ ও জীবনকে দেখবার বুঝবার জয় করবার অফুরন্ত সাহস ও অশিথিল উদ্যম একদিকে, অপর দিকে নিজের দেহের মধ্যে, নশ্বর - মরণশীল ক্ষুদ্র দেহ-আয়তনের মধ্যে দেহাতীতের, শাশ্বত অবিনশ্বর অমৃতের সন্ধানও তপস্যা। এককথায় বহিরঙ্গ বিজিগীষা ও অন্তরঙ্গ আত্ম জিজ্ঞাসা। জগৎ জিজ্ঞাসা ও আত্মবিজ্ঞাসা — দুই-এ মিলে বৃহৎ জিজ্ঞাসা। এরই ফলে অর্জিত হয়েছে, নির্মিত হয়ে মানুষের সমাজ - সংস্কৃতি, শিল্প-বিজ্ঞান, ধর্মদর্শন।

(খ)

সুরকে সুরে রূপায়িত করার প্রয়াসে প্রথম পদক্ষেপ ভাষা। মানব জীবনের সমুন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ বহিরঙ্গ উপাদান ও আবিষ্কার যেমন অগ্নি, তেমনি অন্তরঙ্গ আশা - আবেগের প্রকাশ - বিকাশে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ও আবিষ্কার মানুষের ভাষা। অগ্নির তাপ ও আলো দিয়ে বহিরঙ্গ জীবনকে নানা ভাবে নানাদিকে সমৃদ্ধ করেছে মানুষ একদিকে, অপর দিকে ভাব - ভাবনাকে প্রকাশ ও সঞ্চারণের মাধ্যমে আদান-প্রদানে সামাজিক স্তরে অবিনশ্বর সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্যের দ্বার খুলে দিয়েছে ভাষা। জীবজগতে ভাষা একমাত্র মানুষেরই নিজস্ব অসপত্ন অভিনব সম্পদ।

কীট - পতঙ্গের মধ্যে পরস্পরের সাহচর্য লাভের জন্য যে নিঃশব্দ সঙ্কেত — বা পশু - পাখী যে নানা আত্মরক্ষার ডাক এগুলিকে কি ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না ? জীবন যাত্রার পক্ষে যে সব শব্দহীন সঙ্কেত বা শব্দযুক্ত ইসারা — তার রাগ - ভঙ্গি -

আনন্দ প্রকাশের বিচিত্র ধ্বনিরাশি, তাকেও একজাতীয় ভাষা বলা যায় না কি ?
"সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানও বাংলা ভাষা" — গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ বাসেশ্বর শ' মহাশয় তাঁর গ্রন্থারম্ভে ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস এফ্ হকেট্ সাহেবের যে মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এই প্রশ্নটির চমৎকার উত্তর আছে। গোটাটাই উদ্ধার করা যাক্ —

"From time immemorial, the animals and spirits of Folk-lore have had human characteristics thrust upon them, including always the power of speech. But the cold facts are that Man is the only living species with this power ..... The appearance of language in the universe - at least on our planet - is thus exactly as recent as the appearance of Man himself. ".

আসলে ভাব-ভাবনা মনের সম্পদ, — আর মন আছে কেবল মানুষেরই। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রাণ রক্ষার জন্য প্রকৃতিদত্ত কিছু যান্ত্রিক সংস্কার — জন্ম-লব্ধ এবং একান্তভাবে সীমাবদ্ধ তার অভ্যাসের বাহিরে বিচরণ করবার ক্ষমতা নেই। বানর, ঘোড়া-হাতি-পাখী -বাঘ সার্কাসে যে খেলা দেখায়, সেগুলি মানুষের দ্বারা আরোপিত প্রশিক্ষার যান্ত্রিক ফল — পশু-পক্ষির স্বাভাবিক বিকাশের পরিণাম নয়।

ভাষার সংজ্ঞা কী ? ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

"মনের ভাব - প্রকাশের জন্য, বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, মুক্তভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।" (চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতি কুমার ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৪২)।

বিশেষ লক্ষণীয় যে, (১) মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষা প্রয়োজন। (২) ভাষা নিষ্পন্ন হয় বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে। (৩) বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ। (৪) অর্থবহ বাক্যে তার প্রযুক্তি তাই বিভিন্ন জনসমাজের ভাষাও বিভিন্ন।

(গ)

প্রতিভাষার শব্দসমূহ — বিশেষ বিশেষ কতগুলির ধ্বনি-অণু দিয়ে গঠিত। এদের নাম বর্ণ। এই বর্ণগুলিও তাদের বিন্যাসক্রম স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিতে হয়। কোন ভাষার বর্ণক্রমকেই বদলানো যায় না। কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় —"সিদ্ধবর্ণো সমাম্নায়ঃ।" (১।১।১) পঞ্চাশৎ বর্ণমালা আছে ভারতীয় আর্য ভাষায়। তা দিয়ে যাবতীয় শব্দ রচিত। বর্ণের চিত্ররূপ লিপি। বর্ণগুলি যথাযথ থাকলেও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় — বাংলা, উড়িষ্যা - হিন্দি - মারাঠী প্রভৃতিতে লিপির আকার বিভিন্ন।

ভাষার মুখ্য তথা একমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজন হচ্ছে মনের ভাব - ভাবনাকে প্রকাশ করা। ভাব - ভাবনা কীভাবে ও ক্রমে দেহাভ্যন্তর থেকে বাক্ রূপে প্রকাশিত হয় তার সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন আচার্যগণ।

আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বাক্ শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয় শব্দ ব্রহ্ম। তান্ত্রিক পরিভাষায় শব্দব্রহ্মের নাম পরা বাক্। যা হোক এবিষয়ে মহামহোপাধ্যায় আচার্য — ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যাক্ ———

"অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে জপ ও ধ্যান দুটি প্রধান। জগৎ রহস্য বুঝিবার পূর্বে শব্দতত্ত্ব অথবা বাক্তত্ত্ব জানা আবশ্যক। শব্দ অথবা বাক্ চারি প্রকার। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। পরা বাক্ শব্দ-ব্রহ্ম স্বরূপ পরম শিবের সঙ্গে অভিন্ন। উহার বাহ্যস্ফূর্তি তিন প্রকার। প্রথম পশ্যন্তী রূপে দ্বিতীয় মধ্যমা, তৃতীয় বৈখরীরূপে। সমগ্র বিশ্ব বিশ্লেষণ করিলে যোগদৃষ্টিতে তিনটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যোগী - দের সুপরিচিত। একটি শব্দ, আর একটি অর্থ আর তৃতীয়টি জ্ঞান। * * * * * * এই কারণে শব্দ অর্থ জ্ঞান এই তিনেরই পরস্পর সম্বন্ধ আছে। * * * * * বৈখরী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ পরস্পর ভিন্ন। শব্দবাচক, অর্থবাচ্য, উভয়ের ভেদ আছে। মধ্যমা অবস্থায় শব্দ ও অর্থ উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। পশ্যন্তী অবস্থায় উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ — শব্দ ও অর্থ একই বস্তু, পশ্যন্তী অবস্থায় তিনেরই

পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশমান।" — (পরমার্থ প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, ১৩৪৮)।

অনাহত নাদরূপ শব্দ ব্রহ্ম বা পরাবাক্ অবস্থিত আছে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলে নিষ্কল অনির্বচনীয় নির্বিকার - নিরাকার ব্রহ্ম স্বরূপে। মানব দেহ ভাণ্ডে তার স্থিতি মূলাধার চক্রে। উৎসমের দ্বিতীয় স্তরে পশ্যন্তী -তে শব্দ-অর্থ -জ্ঞান এই তিনটির অভেদ সম্বন্ধে অস্পষ্ট আভাসরূপে স্থিতি। দেহভাণ্ডে মণিপুর চক্রে তার অবস্থান। শাক্ত ভাবনায় ব্রহ্মগ্রন্থি। তৃতীয় স্তর মধ্যমা। এই স্তরে শব্দের ও অর্থের তথা জ্ঞানের ভেদ পরিস্ফুট কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়, কাজেই ভেদাভেদ সম্বন্ধে স্থিত। দেহভাণ্ডে তার অবস্থান অনাহত চক্রে। শাক্ত ভাবনায় বিষ্ণুগ্রন্থি। চতুর্থে, বৈখরী স্তরে শব্দরূপে বাকের প্রকাশ ও পরিণাম। শব্দ ও অর্থ বিভিন্ন হয়েছে। শব্দ বাচক ও অর্থ বাচ্য রূপে ভেদাভেদ সম্বন্ধে ভাষাতে তথা বাক্যে প্রকাশিত। দেহভাণ্ডে তার অবস্থান বিশুদ্ধ চক্রে। শাক্ত ভাবনায় রুদ্রগ্রন্থি। কণ্ঠ থেকে উৎগীর্ণ হয়ে অর্থের দ্যোতনা করে, বাক্ বাক্যে পরিণত হয়।

(ঘ)

বৈখরীর মধ্য দিয়ে বাক্ -এর যে বাক্য পরিণাম অর্থাৎ ভাষা — তার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। বেদের মন্ত্রসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে সম্পাদনা করেছিলেন — মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের বচন ——

পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশভাগ কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদংচক্রে চতুর্বিধম্॥' (১২।৬।৪১)

এই থেকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদবিভাগ করে হলেন বেদব্যাস। সংহিতা - ব্রাহ্মণ - আরণ্যক, উপনিষদ্ এই চতুরংশ নিয়ে বেদ। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব, এই চার বিভাগের মধ্যেই সংহিতাদি ক্রমে সুতন্ত্র বিভাজন হয়েছে। বেদকে বলা হয়

ত্রয়ী। অথর্ববেদের মধ্যে — অথর্ব ও আঙ্গিরস নামে ঋষিদ্বয় আধিদৈবিক যজ্ঞক্রিয়াদি অপেক্ষা আধিভৌতিক লৌকিক ও মাঙ্গলিক কর্মের দিকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অথর্ব বেদের প্রাচীন নামও অথর্বাঙ্গিরস। যাহোক যজ্ঞাদি মুখ্যকর্মে এবং কোন নির্দিষ্ট বৈদিক কর্মে প্রয়োগ স্থান না থাকায় অথর্ব বেদ অনুল্লিখিত এবং ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদেরই মন্ত্র প্রযুক্তির জন্য বোধ হয় ত্রয়ী নামে পরিচিত হয়েছিল বেদ।

যা হোক ঋক্ বেদাদি সংহিতার সূক্তগুলি স্তুতি প্রধান। তার যেসব স্তুতি গীতিরূপে গীত হয় তার নাম সামবেদ। কৌথুমী শাখার সামবেদ সংহিতায় সঙ্কলিত আছে ১৫৪৯টি ঋক্ মন্ত্র, তারমধ্যে ৭৫টি বাদ দিলে (যেগুলি সামবেদেরই নিজস্ব মন্ত্র) বাকি ১৪৭৪টি মন্ত্র ঋক্ - সংহিতারই অন্তর্ভুক্ত। সায়ণ আচার্য বলেছেন —— "গীতিরূপোমন্ত্রাসামানি"। বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম আধুনিক পন্ডিত ডঃ যোগীরাজ বসুর মূল্যবান মন্তব্যটি উদ্ধার করা যাক্ —"সামবেদ-ই আর্য - সঙ্গীতের উৎস। সাম শব্দে সর্বদায় গান বোঝায়। ঋক্ মন্ত্র সাতটি সুর লীলায়িত করিয়া সামগান করা হইত। * * * * এখন সপ্ত সুরকে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, ও নিষাদ বা সংক্ষেপে প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর লইয়া সা (ষা) রি (ঋ) গা, মা, পা, ধা, নি বলা হয়। সাম বেদের যুগে এই সপ্ত সুরের নাম ছিল ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ মন্ত্র ও অতিস্বার্য। নারদ নামে একটি বৈদিক শিক্ষার (Phonetics) গ্রন্থকার এবং বেদভাষ্যকার সায়ণ সাম বেদের সপ্ত সুরকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম নামে অভিহিত করিয়াছেন।" (বেদের পরিচয় ডঃ যোগীরাজ বসু, প্রথম সংস্করণ, কার্ত্তিক, ১৩৭৭)

হরফ প্রকাশিত সামবেদ সংহিতা গ্রন্থের সম্পাদক শ্রী পরিতোষ ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্বগর্ভ মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য ——

''যা শব্দ করে তা সুর, আর সূর্য ওঁ শব্দ করে ভ্রমণ করে বলে সূর্যই সুর। * * * ওঁ উচ্চারণ করে সাম গান করা হয়। সেই সাম গান সূর্যকে ঘিরে হয়। সা = প্রকৃতি বা অদীনা অক্ষয়া ঐশী শক্তি; অম্ = আত্মা, যা সূর্য মন্ডলের মধ্যে আসীন। সুতরাং সূর্যরূপ জগতের আত্মার সঙ্গে যা ওতপ্রোত তা

সাম। আর যেহেতু ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা সাম গান করা হয় সেহেতু ঋক্ই সাম এবং সামই সূর্য। আর যেহেতু সূর্য-ই সাম ও ওঙ্কার এবং সূর্যই প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং প্রাণ ও ওঁ উচ্চারণ করে জীবদেহেই বিচরণ করে। * * * * সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সামের আশ্রয় সুর, সুরের আশ্রয় প্রাণ, প্রাণের আশ্রয় অন্ন, অন্নের আশ্রয় জল, জলের আশ্রয় পুনরায় সুর বা আদিত্য যাকে ঘিরে জল সদা বর্ত্তমান। সুতরাং সুর বা সুর লোকের অথবা স্বর্গলোকের অতীত আশ্রয়ান্তরে আমাদের কেউ নিয়ে যেতে পারে না।" (হরফ প্রকাশনীর — সামবেদ সংহিতা গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীপরিতোষ ঠাকুর। প্রথম প্রকাশ ১৭ই আশ্বিন ১৩৮২)

মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সঙ্গীতের সুরধ্বনি ধারা বৈদিক যুগ থেকে সামবেদ রূপ গোমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র ও সাধনাকে সর্বতোমুখী সমুন্নতির মোহনার দিকে প্রবাহিত করেছে। বেদশাখাগুলির মধ্যে সাম বেদের সমধিক গুরুত্ব স্বীকৃত। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন — "বেদানাং সামবেদো স্মি।" তাছাড়া সঙ্গীত চর্চার জন্য স্বতন্ত্রভাবে গন্ধর্ব বেদ নামে একটি উপবেদের উদ্ভব হয়েছিল এবং এটির প্রণেতা ছিলেন ভরত। সাহিত্যের ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন —— "গীতিকাব্যগুলি তান - লয় যোগে গীত হইত। নিশ্চিত রামায়ণ - মহাভারতাদি যে গীত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া লব - কুশ দ্বারা অযোধ্যার রাজসভায় গান করাইয়াছিলেন এবং কথিত আছে ভরতাচার্যই উহা সুর - লয় সংযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু কি সুর - লয়ে উহা গীত হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। মেঘদূত, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গীতিকাব্য অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব গীতিকাব্য।" (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস শ্রী জাহ্নবী চরণ ভৌমিক এম, এ, বি এল লিখিত এবং ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সহ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রথযাত্রা, ১৩৮২)।

অতএব, বাক্যে চরম প্রকাশ হয়েছে কাব্যে — সুর যুক্ত গীতের মধ্যে। কথা ও সুরযুক্ত গীতিকাব্য তথা গানই যে মানুষের ভাব - ভাবনা, হৃদয়াবেগ ও বোধিবৃদ্ধির পরম আনন্দময় রসসমৃদ্ধ উৎসার তাতে সন্দেহ নেই।

(৬)

সুর বা সুরযুক্ত কথার উৎস এবং তার গুরুত্ব ও সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার অবদান সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, এবার তার মর্মার্থটি উৎঘাটন করে আলোচনার ইতি টানা যাক্। মানুষের ভাষা-সাহিত্য তথা জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরম রূপটি প্রকাশিত হয়েছে কথা ও সুরযুক্ত সঙ্গীতের মধ্যে। স্তোত্র-সাহিত্যের পরমতম ও অন্তরতম রূপটি একমাত্র গীতের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। আর গীতের ব্যাপকতা ও গভীরত্ব কী আধ্যাত্মিক কী সামাজিক সর্ব স্তরই — গীতিমহিমা তার ঐশ্বর্য ও গৌরব তথা প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিসীম।

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের পরিচয় পর্যালোচনা এবং বাংলা ভক্তি সাহিত্যের সহিত তার কি সম্বন্ধ এবং কিভাবে স্তুতিগীতে তার পর্যবসান হয়েছে সে সম্বন্ধে আর নূতন বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করে মহাসাধক ব্রহ্মর্ষি শ্রী শ্রী সত্যদেব রচিত — "সাধন - সমর" গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধার করে সমগ্র আলোচনার উপসংহারে আসা যাক্। "স্তুতি দুই প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। এক আর্তের স্তুতি, অপর কৃতজ্ঞতার স্তুতি। এক বিপদে পড়িয়া, অপর অভীষ্ট সিদ্ধির পর। এই উভয়বিধ স্তুতির দ্বারা প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেরই অর্ধাঙ্গ পরিপূর্ণ। স্তুতির যে কি অপূর্ব শক্তি, তাহা মন্ত্রচৈতন্যকারী সাধকগণ একবার মাত্র পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যতদিন মন্ত্রসমূহ চৈতন্যযুক্ত না হয় — রস ও ভাব সমন্বিত না হয়, ততদিন স্তোত্রাদি পাঠের ফল অতি সামান্য মাত্র — ততদিন উহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভূতিযোগ্য হয় না। বিক্ষিপ্তচিত্ত সাধকগণের পক্ষে ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্র পাঠ উৎকৃষ্টতর প্রার্থনা। কারণ ধ্যান করিতে হয় না — উহা আপনি আসে। অপ্রত্যক্ষ বস্তুর ধ্যানই হয় না। যখন যা আসেন তখন তিনি প্রত্যক্ষযোগ্য হন, তখনি সাধক আত্মহারা হইয়া, মুখনেত্রে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়ে। ইহারই নাম ধ্যান। অনেকে মনে করেন — স্তোত্র পাঠ বহিরঙ্গ সাধনা, সুতরাং পরিত্যাজ্য। অবশ্য যাহাদের সর্বদা ধ্যানাবস্থা আসিয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র ও নিরোধ ভূমিক হইয়াছে, মাত্র তাঁহারাই একথা বলিতে পারেন। বর্তমান যুগের মহাপুরুষ আচার্য শঙ্কর এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও

কিন্তু ইচ্ছাপূর্বকই হউক আর লোকহিতৈষণা প্রযুক্তই হউক বিক্ষিপ্ত চিত্তের আদর্শটি নিয়াছিলেন । * * * * যাহা হউক ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ যে শীঘ্র ফলপ্রদ ইহা অনেকস্থলে পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে । স্তোত্র-পাঠ সাধককে যত শীঘ্র ধ্যানাবস্থায় আনয়ন করে, ধ্যানের ভাণ তত শীঘ্র করে না । বেদান্তশাস্ত্রে যাহাকে মনন বলে, যোগশাস্ত্রে যাহাকে ধারণা বলে স্তোত্র পাঠ তাহারই অন্তর্গত ।" (সাধন সমর বা দেবীমাহাত্ম্য, ২য় খন্ড, ব্রহ্মর্ষি শ্রী সত্যদেব রচিত, ১৩৬১) ।